চিত্রকল্প

আশাপূর্ণা দেবী

আদিত্য প্রকাশালয়
২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ :
বৈশাখ ১৩৬৪

প্রকাশক :
শ্রীহরিপদ বিশ্বাস
আদিত্য প্রকাশালয়
২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

মুদ্রাকর :
দি বি. জি. প্রিন্টার্স
১৯/এ, গোয়াবাগান স্ট্রী
কলিকাতা-৭০০০০৯

এতে আছে বিখ্যাত চারটি উপন্যাস

- হারানো খাতা— ১
- বংশধর— ২০৫
- আবৃতা— ৩২৩
- অনাবৃতা— ৪০৩

হারানো খাতা

ভালোবাসাটার সৃষ্টি হয়েছিল বড় আকস্মিকভাবে। প্রায় গল্প উপন্যাসের নায়ক নায়িকার মতো। আর সেটা যেন সেকেলে লেখকের কোন উপন্যাস! রেল গাড়িতে যেতে যেতে প্রেম সঞ্চার একালে আবার কে লিখতে যায়।

কিন্তু যার যা ভাগ্য।

ভবভূতি আর মালবিকা, এই দুই বেচারীর ভাগ্যে ওই 'সেকেলে' ব্যাপারটাই লেখা ছিল। অথচ দু'জনেই এই কলকাতা শহরের বাসিন্দা। কলকাতার এই লক্ষ লক্ষ মানুষের ভীড়ের মধ্যে কে কোথায় মিশে গিয়ে হারিয়ে থেকেছিল, কে জানে!

এর আগে হয়তো বা দু'জনে অনেকবার একই রাস্তা দিয়ে হেঁটেছে, একই ট্রামে বাসে চেপেছে, একই দোকানে ঢুকে দরাদরি করেছে, কেউ কাউকে তাকিয়ে দেখেনি, কেউ কারো চোখে চোখ ফেলেনি।

ফেলেনি, মানে পড়েনি।

আবার এও হতে পারে, চোখ পড়েছে, দু'জনে দুজনকে দেখেওছে, কিন্তু সে দেখা চোখের অন্তরালে কোনো ছাপ ফেলতে পারেনি। চলন্ত গাড়ি থেকে পাশের গাছপালা দেখার মত চোখের ওপর দিয়ে ভেসে গেছে। চোখে পড়লো সেদিনের সেই রেল যাত্রায়।

ছাপ পড়ে গেল মুহূর্তে।

কারণের মধ্যে দু'জনের গন্তব্যস্থল ছিল একই।

অবশ্য ওটাকে 'কারণ' দেখালে সেটা প্রায় হাসির মতই একই গন্তব্যস্থলের যাত্রীরা তো সাধারণতঃ একই রেলগাড়িতে ওঠে। কেউ হয়তো মাঝখানে নেমে যায়, শেষ পর্যন্ত অনেকেই থেকে যায়।

কারণটা হচ্ছে ওরা যে শহরটায় (যদি তাকে শহরই বলা যায়)

গিয়ে নামবে, সেটা এখন প্রায় পরিত্যক্ত শহর। অন্ততঃ বেড়াতে বিশেষ কেউ যায় না।

নামটা উহ্য থাক, শুধু এইটুকুই বলবো, অথচ সাঁওতাল পরগণার এই ছোট শহরটি একদা শুধু যে চেঞ্জে বেড়াতে আসারই জায়গা ছিল তা নয়, অ্যারিস্টোক্রাটদেরই একচেটে ছিল।

এখানে ছবির মতো সুন্দর সুন্দর যে কটেজগুলি ছিল, তাদের নাম গুলিও ছিল শ্রুতিসুখকর, কাব্যসুষমা মণ্ডিত, কিংবা অভিধান মন্থন করা দুর্বোধ্য।

এই বাংলোগুলির বা কটেজগুলির বেশীর ভাগই ছিল দেশের যতো গণ্যমান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের, যেমন কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী এদের বিশ্রাম নিবাস।

যিনি যেমন পেরেছিলেন, তেমন তেমনই একখানা বাড়ি বানিয়ে রেখেছিলেন, ছুটি হলেই ছুটে ছুটে চলে আসতেন এই অভিজাতদের একচেটিয়া ভূমিতে। আর শুধু যে তাঁরাই, মানে ওই গৃহবানেরাই, আসতেন তা নয়, তাঁদের সাদর আমন্ত্রণে তাঁদের বন্ধুজনেরাও আসতেন। বিদগ্ধ জনেদের সাহচর্য আর কে জোগাতে পারবে বিদগ্ধ জনেরা ছাড়া?

বলতে গেলে—

সাঁওতাল পরগণার এই ছোট্ট শহরটিই ছিল তখন বাংলাদেশের সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র। অথবা প্রাণের কেন্দ্র।

যাঁরা আসতেন, যাঁরা যাঁরা এখানে এসেছেন, তাঁরাই ছিলেন তখনকার দিনে সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। ওই সংস্কৃতিবানেরা কোন না কোন সূত্রে একেক সময় এখানে এসে ঘুরে গেছেন।

এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অতুলনীয়।

ভীষণে মধুরে নয়, মধুরে সুন্দরে। এখানকার এক ঝর্ণাধারা ভূগোল বিখ্যাত, এখানকার খনিজ সম্পদও উল্লেখযোগ্য। মোটের ওপর এক ডাকে চিনতে পারার নাম ছিল।

অতএব কী মহিলা, কী পুরুষ, যদি নিজেকে সংস্কৃতিবানেদের

মধ্যে একজন ভাবতে ইচ্ছুক হতেন, তবে তাঁরা একবারও অন্ততঃ এই শহরে বেড়িয়ে যেতেন, আর সঙ্গতি থাকলে বাংলো বানাতেন। কটেজ বানাতেন।

কিন্তু কালক্রমে যা হয়।

কালক্রমে পরমা সুন্দরীর যৌবন ঝরে, পরম বীর্য্যবানের বার্দ্ধক্য আসে, জরা ধরে।

'উদয়-অস্ত' শব্দটা শুধুই সূর্যের বেলায় একচেটে নয়, উদয়-অস্ত ঘটে চলেছে সব কিছুরই। ব্যক্তি জীবনের উদয়-অস্ত আছে, সমাজ জীবনের আছে, রাষ্ট্রের আছে, জাতির আছে, নদীর আছে, শহরের আছে।

কালক্রমে তারা আপন আপন কেন্দ্রে উদিত হচ্ছে ও অস্তমিত হচ্ছে। ইতিহাস তার সাক্ষ্য বহন করছে।

তা নিয়মগত যাই থাক—

সাঁওতাল পরগণার এই ছোট্ট শহরটির পরিত্যক্ত হবার দৃশ্যগত একটা কারণ এই, মানুষের ক্রমশঃ আর 'অল্পে সুখ' নেই। অল্পে সুখী হওয়াটাকে মানুষ দৈন্য মনে করতে শিখেছে। অতএব মাত্র কয়েক মাইল পথ অতিক্রম করে চেঞ্জে যাওয়াটাকে অবজ্ঞার চোখে দেখা ফ্যাশান হয়ে গেল। দূরের পথ পাড়ি দিতে না পারলে মান মর্য্যাদা কোথায়?

একদা যে কাশী যাওয়াকে লোকে পশ্চিমে যাওয়া বলতো, এ কথা শুনলে এ যুগ গায়ে ধুলো ছুঁড়ে মারে।

অতএব বিত্তবান সংস্কৃতিবানেরা তাঁদের স্বর্গে যাত্রা করতে শুরু করলেন আকাশে উড়ে, সাগরে ভেসে। অনেক সমারোহময় ঠাঁই বিস্মৃতির অন্ধকারে মুখ থুবড়ে পড়ে রইলো।

ওরা যেখানে যাচ্ছিল, সাঁওতাল পরগণার সেই একদা কুসুমিত, আর এখন জঙ্গল হয়ে যাওয়া ছোট শহরটিও তেমনিই পড়ে আছে।

ছবির মত কটেজগুলির যৌবন-হারা রূপসীর মতো চুল ঝরেছে, দাঁত পড়েছে, চামড়া ঝুলে পড়ে শিরাবহুল শীর্ণ শরীরটা কুঁজো হয়ে

হুমড়ি খেয়ে দাঁড়িয়ে আছে, অথবা পড়ে পড়ে ধুলিসাৎ হচ্ছে। নিতান্ত যারা চির বাসিন্দা, অথবা কার্যকারণে আসতে হয়েছে, তারা আছে এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে।

ওদের গাছে জল পড়ে, ওদের বারান্দায় কাপড় শুকোয়, ওদের রান্নাঘরে উনুন জ্বলে।

এমনি একটা বাড়ির উদ্দেশেই মালবিকার যাত্রা, কিন্তু ভবভূতির ?

না, তার জন্যে কোনোখানে কেউ রান্না করে রেখে ট্রেনের সময় দেখবে না।

প্রথমটা যখন গাড়িতে উঠেছিল ওরা, তখন কেউ কাউকে গ্রাহ্য করেনি। শুধু ভবভূতি দেখেছে মেয়েটা আধুনিক হলেও অতি আধুনিক নয়। মাথার উপর দু'ফুট উঁচু চূড়ো নেই, চোখের কোণে ডানামেলা পাখির গড়নের কাজল নেই, নখের আগায় আরো খানিকটা বাড়তি বর্ণাঢ্য নখ নেই।···তাছাড়া মেয়েটার ব্লাউসের হাতা আছে, শাড়িতে শাস আছে, এবং সবটা মিলিয়ে একটি ভব্য ছন্দ আছে।

মেয়েটা দেখতে বেশ, তবে বয়স বোঝা যাচ্ছে না।

দেখে ভেবেছিল ভবভূতি।

আর মালবিকা ?

মালবিকা দেখেছিল, ছেলেটা একটু অধিক পরিমাণে স্মার্ট। ওর টেরিকট ট্রাউজার, টেরিলিন বুশশার্ট, শৌখিন ধাঁচের জুতো, আরো শৌখিন চওড়া ব্যাণ্ডের রিস্টওয়াচ, এসবই ওর ওই স্মার্টনেসের সহায়ক। আরো সহায়ক, পাতলা লম্বা দীর্ঘ শরীরটা।

মালবিকা ভাবলো, ছেলেটা দেখতে বেশ, তবে নিজেকে একটু জাহির করা ভাব আছে।

বয়সটা কতো কে জানে। ত্রিশের কিছু ওপরই হবে হয়তো।

তারপর আর কী ?

যে যার জানলার ধারে এক খানা বই খুলে বসলো।

গাড়িতে যে আর যাত্রী ছিল না এমন মনে করবার হেতু ছিল না, কিন্তু ঠিক ওদের ধরনের কেউ ছিল না।

অনেকক্ষণ পর মালবিকা ওয়াটার বট্‌ল খুলে জল খেলো।

ভবভূতি তাকিয়ে দেখলো।

ওব জল খাওয়া হয়ে গেলে বলে উঠলো, 'সামনের স্টেশনে আপনার ওয়াটার বট্‌লটা ভরে এনে দেব।'

মালবিকা ফিরে তাকালো, চোখ কুঁচকে বললো, 'কি বলছেন?'

'বলছি সামনের কোন ভাল স্টেশনে আপনার বট্‌লটা ভরে এনে দেব।'

মালবিকাব বুঝতে দেরী হল না এ হচ্ছে আলাপ করার নতুন এক অভিনব চাল। মালবিকা ভাবলো, যা ভেবেছি তাই, একটু মস্তান মার্কা। এই বয়সে এটা মানায় না। মনে মনে একটু শক্ত হলো সে।

মুখেও বিশেষ নরম রইল না, বেশ তীক্ষ্ণ গলাতেই প্রশ্ন করলো, 'তার মানে?'

ভবভূতি হাতটা প্রায় বাড়িয়ে ধরে বললো, 'তার মানে আপনার সঞ্চিত জলটা আমি খাবো।'

শক্ত হয়ে ওঠা মালবিকার হঠাৎ ভারী হাসি পেয়ে গেল। চেষ্টা করে হাসি চাপলেও হাসিটা মুখের রেখায় রেখায় ছড়িয়ে পড়ে ধরা পড়িয়ে দিল। তবু মালবিকা গম্ভীর গলায় বল্‌লো, 'তা সেটা বলাই কি বেশি সহজ ছিল না?'

জলটা দিয়ে দিল ওর হাতে।

ভবভূতি ওটার ছিপি খুলতে খুলতে মৃদু হেসে উত্তর দিল, 'মোটেই না। কোনো ভদ্রব্যক্তি সহজে এমন কথা বলতেই পারে না, আপনার জলটা আমায় দিয়ে দিন শেষ করি'

'তাই আগে থেকে ধার শোধের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তবে জল গ্রহণ?'

মালবিকা হেসে ফেললো।

মানে আর চাপতে পারলো না। জলের পাত্রটা নিঃশেষ করে সেটা মালবিকার হাতে ফেরৎ দিয়ে ভবভূতি বললো, 'জলদান একটা পুণ্যকাজ।'

'তাই বুঝি?' মালবিকা বলে, 'তাহলে অজান্তে একটা পুণ্য কাজ করে ফেললাম বলুন?'

'নিশ্চয়!'

বলে ভবভূতি পকেট থেকে সিগারেট কেস বার করে বললো, 'অনুমতি পেতে পারি?'

মালবিকা গম্ভীর ভাবে বলে, 'আমি আপনার গুরুজন নাকি?'

ভবভূতি অম্লান মুখে বললো, 'মহিলামাত্রেই পুরুষ জাতির গুরুজন।'

'বাঃ চমৎকার! বেশ একটা নতুন কথা শিখলাম। যাক অনুমতির অপেক্ষায় যখন বসে রইলেন, তখন দিলাম অনুমতি।'

মালবিকা আর কথা বাড়াবে না ঠিক করে আবার বইটা খুলে বসলো।

কিন্তু কতক্ষণই বা?

ভবভূতি প্রশ্ন করলো, 'কোথায় যাবেন?'

মালবিকা বললো, 'অতি তুচ্ছ একটা জায়গায়।'

ভবভূতি বললো, 'প্রয়োজন যখন যাবার তখন আর কোনো তুচ্ছই তুচ্ছ থাকে না। আমিও তো প্রয়োজনে পড়ে এমন একটা জায়গায় চলেছি, যেখানে আমি নাকি জ্ঞান হবার পর আর যাইনি। অথচ আমার বাবা প্রতি সপ্তাহে যেতেন।'

মালবিকার মনে হলো, আমি যেখানে যাচ্ছি, সেখানেই নয়তো? কেন মনে হলো কে জানে।

মালবিকা বললো, 'এ রকম তো কতই হয়। আমার বাবা কোন একসময় গ্রামেই বাস করতেন, কিন্তু আমি জীবনেও সে গ্রামে যাইনি।'